ভারতবর্ষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানেই গড়ে উঠেছে একটা ছোট্টো বাজার। পিছনে গ্রাম, ঘন বাঁশবনে ঢাকা। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, তাই মাঝে-মাঝে বিমর্ষ সভ্যতার মুখ চোখে পড়ে—যখন কিনা কাঁচা রাস্তা ধরে সবুজ ঝোপের ফাঁকে এগিয়ে আসে কোনো যুবক বা যুবতী; পরনে যা পোশাক, তা আমেদাবাদের কারখানায় তৈরি। কিন্তু বাজারে বিদ্যুৎ আছে। তিনটে চায়ের দোকান, দুটো সন্দেশের, তিনটে পোশাকের, একটা মনোহারির, দুটো মুদিখানার। আর একটা আড়ত আছে। একটা হাস্কিং মেশিন আছে। তার পিছনে ইটভাটা আছে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা আসে। রাত নটা অবধি জোর জমাটিভাব থাকে। তারপর সব ফাঁকা। শুধু কিছু আলো জ্বলে। কিছু নেড়িকুত্তার ছায়া ঘোরে পিচের ওপর। মাঝে-মাঝে চলে যায় ট্রাক দূরের শহরের দিকে। আবার সব চুপচাপ। বাঁকের মুখে আদ্যিকালের বটগাছে পেঁচার ডাকও স্তব্ধতার অন্তর্গত মনে হয়।

সময়টা ছিল শীতের। বাজারের উত্তরে বিশাল মাঠ থেকে কনকনে বাতাস বয়ে আসছিল সারাক্ষণ। তারপর আকাশ ধূসর হলো মেঘে। হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। রাঢ়বাংলার শীতে এমনিতেই খুব জাঁকালো। বৃষ্টিতে তা হলো ধারালো। ভদ্রলোকে বলে ‘পউষে বাদলা’। ছোটোলোকে বলে ‘ডাওর’। আর বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোরালো হলে তারা বলে ‘ফাঁপি’। সেবার এই আবহাওয়া হয়ে পড়ল ‘ফাঁপি’। তখনও দূরের মাঠে ধান কাটা

হয়নি। এই অকাল-দুর্যোগে ধানের ক্ষতি হবে প্রচণ্ড। তাই লোকের মেজাজ গেল বিগড়ে। চাষাভুষো মানুষ চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে-দিতে প্রতীক্ষা করতে থাকল রোদে ঝলমল একটা দিন এবং মুণ্ডুপাত করতে থাকল আল্লা-ভগবানের। শেষ অবধি ক্ষিপ্ত কোনো-কোনো যুবক চাষি চেঁচিয়ে বলে দিল—মাথার ওপর আর কোনো শালা নেই রে—কেউ নাই।

কেউ নেই মাথার ওপর, তখন যা খুশি করা যায়। ক্ষিপ্ত মেজাজে কথায় কথায় তর্ক বাধে। মারামারির উপক্রম হয়। এবং তর্কের কোনো প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ নেই—একটা কিছু পেলেই হলো। সেই দুরন্ত শীতের অকাল-দুর্যোগে গ্রামের ঘরে বসে কারো সময় কাটে না। সবাই চলে আসে সভ্যতার ছোট্ট উনোনের পাশে হাত-পা সেঁকে নিতে। এইটুকুই যা সুখ তখন। এবং অলস দিনকাটানোর একঘেয়েমি দূর করতেই নানান কথা আসে। বোমবাইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা গায়ক, অথবা ইন্দিরা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী, এম.এল.এ.—নয়তো সরা বাউরি সে-সবই এসে পড়ে। জোর কথা কাটাকাটি হয় চাওলার বিক্রিবাটা বাড়ে। ধানের মরশুম—আজ না-হোক, কাল পয়সা পাবেই, তাই ধারের অঙ্ক বেড়ে চলে।

সেই সময় এল এক বুড়ি। থুত্থুড়ে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি। রাক্ষুসী চেহারা। একমাথা সাদা চুল। ছেঁড়া নোংরা একটা কাপড় পরনে, গায়ে জড়ানো তেমনি চিটচিটে তুলোর কম্বল, এক হাতে বেঁটে লাঠি। পিচের পথে ভিজতে-ভিজতে দিব্যি একই তালে হেঁটে এল। ক্ষয়া খর্বুটে মুখে তার সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্ন প্রকট। তর্কের মধ্যে চায়ের দোকানে ঢুকে চা চাইল সে। তাকে দেখে সবাই তর্ক থামাল। এই দুর্যোগে কীভাবে বেঁচেবর্তে হেঁটে আসতে পারল, সেটাই সবাইকে অবাক করেছিল।

চা খুব আরামে গিলে বুড়ি সবার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। তখন একজন তাকে জিজ্ঞেস করল—ও বুড়ি, তুমি এলে কোত্থেকে?

বুড়ি বড়ো মেজাজি। গজগজ করে জবাব দিল—সে-কথায় তোমাদের কাজ কী বাছারা?

ওরা হেসে উঠল—। ওরে বাবা! ভারি তেজি দেখছি! এই বাদলায় তেজি টাট্টুর মতন বেরিয়ে পড়েছে।

বুড়ি খেপে গেল।—তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু! খবর্দার, অকথাকুকথা বোলো না। আমি যেখান থেকেই আসি, লোকের কী?

একজন ঠান্ডা মাথায় বলল—ও বুড়ি, তুমি থাকো কোথায়, তাই জিজ্ঞেস করছে এরা।

—তোমাদের মাথায়।

বলেই সে কম্বলের ভেতর থেকে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা পয়সা খুলতে থাকল। তারপর চায়ের দাম মিটিয়ে আবার রাস্তায় নামল।

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল—মরবে রে, নির্ঘাত মরবে বুড়িটা!

বুড়ি ঘুরে বলল—তোরা মর্, তোদের শতগুষ্টি মরুক।

সবাই দেখল বুড়ি নড়বড় করে বাঁকের মুখের বটতলায় গেল। বটতলাটা ফাঁকা। মাটি ভিজে প্রায় কাদা হয়ে রয়েছে। সে সবার অবাক চোখের সামনে সেখানে গিয়ে গুঁড়ির কাছে একটা মোটা শেকড়ে বসে পড়ল। শেকড়টার পিছনে গুঁড়ির গায়ে খোঁদল আছে। সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়াল সে। বোঝা গেল, বুড়ির এ অভিজ্ঞতা প্রচুর আছে। অর্থাৎ সে বৃক্ষবাসিনী।

কেউ কেউ বলল—বরং বারোয়ারিতলায় গেলেই পারত। নির্ঘাত মরে যাবে। এ-কথার পর স্বভাবত এবার বুড়িকে নিয়ে অনেক কথা এসে পড়ল। আবার জমে গেল।...

পউষে বাদলা সম্পর্কে গ্রামের 'ডাকপুরুষের' পুরোনো 'বচন' আছে। তা হল: শনিতে সাত, মঙ্গলে পাঁচ, বুধে তিন—বাকি সব দিন-দিন। অর্থাৎ শনিতে বাদলা লাগলে সাতদিন থাকবে, মঙ্গলে পাঁচদিন, বুধে তিনদিন।

অন্যদিনে লাগলে একদিনের ব্যাপার। এ বাদলা লেগেছিল মঙ্গলে। কেউ অবশ্য হিসেব করেনি—কিন্তু যেদিন ছাড়ল, সেদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল একেবারে। সূর্যের উজ্জ্বল মুখ দেখা গেল। আর, সবাই আবিষ্কার করল বটতলায় সেই গুঁড়ির খোঁদলে পিঠ রেখে বুড়ি চিত হয়ে পড়ে আছে—নিঃসাড়।

অনেকটা বেলা হলেও সে নড়ছে না দেখে চাওলা জগা বলল—নির্ঘাত মরে গেছে বুড়িটা।

একজন বলল—সর্বনাশ! তাহলে শ্যালকুকুরে ছিঁড়ে খাবে যে! গন্ধে টেঁকা যাবে!

একজন দুজন করে ভিড় বাড়তে থাকল। কেউ কেউ বুড়ির কপাল ছুঁয়ে দেখল—প্রচণ্ড ঠান্ডা। একজন নাড়িও দেখল—কোনো স্পন্দন নেই। অতএব মড়াই বটে।

চৌকিদারকে খবর দেওয়া হল। সে এসে বলল—থানায় খবর দিয়ে কী হবে? ফাঁপিতে এক ভিখিরি পটল তুলেছে, তার আবার থানা-পুলিশ! পাঁচ কোশ দূরে থানায় খবর দাও, তারপর ওনার আসতে আসতে রাত-দুপুর। ততক্ষণে গন্ধ ছুটবে। কবে মরেছে হিসেব আছে নাকি? দেখছ না, ফুলে ঢোল হয়েছে কেমন।

—তাহলে কী করব চৌকিদারদা?

—নদীতে ফেলে দিয়ে এসো! ঠিক গতি হয়ে যাবে—যা হবার!

বিজ্ঞ চৌকিদারের পরামর্শ মানা হলো। মাঠ পেরিয়ে দু-মাইল দূরে নদী। এখন শুকনো। সেখানে চড়ায় ফেলে দিয়ে এল কজন মিলে। বাঁশের চ্যাংদোলায় ঝোলানো হয়েছিল। সেটাও ফেলে দিয়ে এল ওরা। বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল।

ফিরে এসে সবাই দিগন্তে চোখ রাখল ঝাঁকে ঝাঁকে কখন শকুন নামবে।

হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। মাঠ পেরিয়ে একটা চ্যাংদোলা আসছে। সেটা যখন বাজারে পৌঁছোল তখন জানা গেল ব্যাপারটা। সেই বুড়ির মড়াটাই তুলে নিয়ে আসছে মুসলমানপাড়ার লোকেরা। আরবি মন্ত্র পড়ছে ওরা। মাথায় টুপিও পরেছে কেউ কেউ।

যারা ফেলে দিয়ে এসেছিল, তারা হিন্দু। তারা অবাক হয়ে এবং রেগে গিয়ে জানতে চাইল—কী ব্যাপার?

না—বুড়ি যে মুসলমান।

প্রমাণ?

প্রমাণ অনেক। অনেকে তাকে শুনেছে বিড়বিড় করে আল্লা বা বিসমিল্লা বলতে। এমনকী গাঁয়ের মোল্লাসায়েব অকাট্য শপথ করে বললেন—আজ ফজরে (ভোরের নমাজের সময়) যখন নমাজ সেরে এদিকে বাস ধরতে আসছি, তখনই বুড়ি মারা যাচ্ছিল। ওকে স্পষ্ট কলমা পড়তে শুনলাম। তা—কে জানে, বুড়ি মরছে? আমি যাচ্ছি শহরে—মামলার দিন। তাই দেখা হল না ব্যাপারটা। ফিরে এসে শুনি ওকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তৌবা! তৌবা! তা কি হয় আমরা বেঁচে থাকতে? তাই কবরে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

গাঁয়ের ভটচাজমশাই সবে বাস থেকে নেমেছেন। উঁকি মেরে সব দেখে-শুনে বললেন—অসম্ভব। আমিও তো মোল্লার সঙ্গে একই বাসে আজ শহরে গিয়েছিলুম। আমি স্পষ্ট শুনেছি, বুড়ি বলছিল শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।

তাঁর সপক্ষে অনেক প্রমাণ জুটে গেল। নকড়ি নাপিত দিব্যি করে বলল—কাল আমি কামাতে বসব বলে বটতলায় এসেছিলাম। দেখলাম বসা যাবে না। তখন বুড়িকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি আপন মনে বলছে—হরিবোল, হরিবোল!

—ভুল শুনেছ। ফজলু সেখ বলল।—আমি স্বকর্ণে শুনেছি, বুড়ি লাইলাহা ইল্লাল্ল বলছে!

নিবারণ বাগদি রাগী লোক। একসময় দাগি ডাকাত ছিল। চেঁচিয়ে উঠল—মিথ্যে!

করিম ফরাজি এখন খুব নমাজ পড়ে এবং 'বান্দা' মানুষ। একদা সে ছিল পেশাদার লাঠিয়াল। নিবারণের চ্যাঁচানি বরদাস্ত করবে কেন সে? আরো চেঁচিয়ে বলল—খবরদার!

বচসা বেড়ে গেল। তর্কাতর্কি উত্তেজনা হল্লা চলতে থাকল। তারপর দেখা গেল একদল লোক সেই বাঁশের চ্যাংদোলাটা নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। দেখতে-দেখতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়াল চারদিকে। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হতে থাকল। আর তারপরই দেখা গেল গ্রাম থেকে অনেক লোক দৌড়ে আসছে। সবার হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

চ্যাংদোলাটা তখন পিচের ওপর। বুড়ির মড়ার দু-পাশে স্পষ্ট দুটো জনতা দাঁড়িয়ে গেছে। দু-দলের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। পরস্পরকে লক্ষ করে গালাগালি চলছে। মাঝে-মাঝে মোল্লাসায়েব চেঁচিয়ে উঠছেন—মোছলেম ভাইসকল! জেহাদ, জেহাদ। নাকায়েতকবির—আল্লাহু আকবর!

অন্যদিকে ভটচাজমশাই গর্জে বললেন—জয় মা কালী! যবন নিধনে অবতীর্ণ হও মা। জয় মা কালী কি জয়!

ধুন্ধুমার গর্জন প্রতিগর্জন এবং দেখা গেল, বিপন্ন আইনরক্ষক বেচারা নীল উর্দিপরা চৌকিদার তার লাঠিটি উঁচিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং দু-পক্ষকেই কিছু বলার চেষ্টা করছে। যখনই মুসলিমপক্ষ এক-পা এগিয়ে আসে সে মরিয়া হয়ে লাঠিটা পিচে ঠুকে গর্জায়—সাবধান। আবার হিন্দুপক্ষ এগোলে সে একইভাবে সেদিকে লাঠি ঠুকে চেঁচায়—খবরদার!

কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে—সে এবার পর্যায়ক্রমে পাগলের মতন দুদিকে একবার করে পিচে লাঠি ঠুকতে শুরু করল। খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দে কাঁপতে থাকল।

তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বুড়ির মড়াটা নড়ছে। নড়তে-নড়তে উঠে বসার চেষ্টা করছে। দু-দিকের সশস্ত্র জনতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চৌকিদার হাঁ করে দেখছে।

তারপর বুড়ি উঠল। উঠে দু-দিকে তাকাল—ভিড় দুটোকে, দেখল। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। সেই বিকৃত মুখে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল সে।

চৌকিদার এতক্ষণে মুখ খুলে বলল—বুড়িমা! তুমি মরনি!

—মর্, তুই মর্। তোর শতগুষ্টি মরুক!

দু-দিকের ভিড়ও চেঁচিয়ে উঠল—বুড়ি! তুমি মরনি!

—তোরা মর্। তোরা মর্ মুখপোড়ারা!

—বুড়ি, তুমি হিন্দু না মুসলমান?

বুড়ি খেপে গিয়ে বলল—চোখের মাথা খেয়েছিস মিনসেরা? দেখতে পাচ্ছিস নে? ওরে নরকখেকোরা, ওরে শকুনচোখোরা। আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে? চোখ গেলে দেবো—যা, যা, পালাঃ।

বলে সে নড়বড় করে রাস্তা ধরে চলতে থাকল। ভিড় সরে তাকে পথ দিল। শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল।